সংলাপ ও সংস্কার: নাগরিক ভাবনা

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, **সুজন**-সুশাসনের জন্য নাগরিক (১৬ অক্টোবর ২০০৬)

সংলাপ এখনো চলছে – এতে আমরা আনন্দিত। সংলাপের সফলতা সকলের মত আমাদেরও কাম্য। কারণ যথাসময়ে একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হওয়া আবশ্যক, যাতে আমাদের গনতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকতে পারে। তবে দুই নেতার মধ্যে কী আলাপ-আলোচনা হচ্ছে তা আমাদের জানা নেই। শোনা যায়, ব্যক্তি-বাদ-দেয়া-না-দেয়ার ব্যাপারে মতানৈক্যের মধ্যে সংলাপ আটকে গিয়েছে। কিন্তু পাঁচজন ব্যক্তিই কি আমাদের সমস্যার একমাত্র কারণ? তাদের অপসারণই কী মূল সমস্যার সমাধান করতে পারবে? নাগরিক হিসেবে এ সর্ম্পকে আমরা কী ভাবছি?

কেন সংলাপ?

সংলাপের উদ্দেশ্য হলো আমাদের রাজনীতিতে বর্তমান অচলাবস্থার অবসান। **বিরাজমান অচলাবস্থার একটি প্রধান উৎস হলো আগামী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানকে নিয়ে একটি দুঃখজনক বিতর্ক। আরেকটি উৎস হলো নির্বাচন কমিশনের অকার্যকারিতা এবং এই গুরুত্বর্পূণ প্রতিষ্ঠানটির প্রতি জনগনের ব্যাপক আস্থাহীনতা। তবে, আমাদের মতে, সর্বাধিক গুরুত্বর্পূণ হলো আমাদের নষ্ট রাজনীতি, যার দুষ্ট সংস্পর্শে এসে জড়িত হয়ে ভাল মানুষও পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ছেন এবং অনেকে দুর্বৃত্তে পরিণত হচ্ছেন।** নাগরিক হিসেবে আমরা মনে করি যে, এ সকল সমস্যার সমাধানেই সংলাপ নিবিষ্ট হতে হবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানকে নিয়ে বির্তকের মূল কারণ হচ্ছে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত সংবিধান সংশোধন। সরকার ২০০৪ সালে সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারপতিদের বয়স বাড়িয়ে বিচারপতি কে এম হাসানের আগামী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। অনেকে মনে করেন যে, বিচারপতি হাসান একসময়ে বিএনপির রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন বলে সরকার তা করেছে। এ কারণে ১৯৯৬ সালের আওয়ামী লীগ সরকার সুপ্রীম কোর্টে উন্নীত করার ব্যাপারে বিচারপতি হাসানকে ডিঙ্গিয়েছে। এমনিভাবে প্রধান বিচারপতি হিসেবে তাকে মনোনয়ন দেয়ার ব্যাপারে জোট সরকারও অন্যদেরকে ডিঙ্গিয়েছে। তাই উভয় দলই বিচারপতি হাসানকে নিয়ে পিংপং খেলা খেলেছে।

বিচারপতি হাসানকে নিয়ে সৃষ্ট বিতর্কের জন্য দায়ী কে? বিচারপতি হাসান নিজে, না সরকার? বিচারপতি হাসান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হওয়ার জন্য কারো কাছে ধর্ণা দিয়েছেন বলে মনে হয় না। অনেকের ধারণা, বর্তমান সরকারই সন্দেহজনক উদ্দেশ্য নিয়ে সংবিধান সংশোধনের মেনিপুলেশনটি করেছে। তাই বিচারপতি হাসানকে নিয়ে দুঃখজনক বির্তকের মূল কারণ সরকারি দলের অসদাচারণ। চার দলীয় জোট সরকারই নৈতিকতাবোধ সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে এবং প্রশ্ন উঠবে জেনেও সংবিধান সংশোধন করেছে।

প্রসঙ্গত, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাটি নিয়েই গুরুতর বিতর্ক রয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তীকাল থেকেই নির্বাচনে কারচুপি হয়ে আসছে। আশির দশকের স্বৈরাচারী শাসনামলে ভোট কারচুপি জনগণের ভোটাধিকার হরণে পর্যবেশিত হয়েছে। তবে নব্বইয়ের গণআন্দোলনের মাধ্যমে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর ১৯৯৪ সালের মাগুরার উপনির্বাচনে ভোট কারচুপি ছিল একটি অতি গর্হিত কাজ। এ গর্হিত কাজের জন্য দায়ী ছিল তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল ও তাদের মনোনীত প্রার্থী। একইসাথে দায়ী ছিল নির্বাচন কমিশন, কারণ কমিশন এ অপকর্মের প্রতিরোধ এবং প্রতিকার কোনটাই করতে পারে নি। এ পরিস্থিতিতে কাঙ্ক্ষিত এবং যুক্তিযুক্ত পদক্ষেপ হতো রাজনীতিবিদদের ও রাজনৈতিক দলের সদাচারণ নিশ্চিত করার এবং নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করার কার্যকর পদক্ষেপ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো দাবি তোলে নির্বাচনের সময়ে 'পাহারাদারের' ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের। যা ছিল জোড়াতালির বা 'পায়ে ব্যাথার জন্য মাথায় মলম লাগানোর' মতো সমাধান! নিঃসন্দেহে এটি ছিল সমস্যা এড়িয়ে যাওয়ার বা ধামাচাপা দেয়ার একটি পন্থা। এছাড়াও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা আমাদের সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর ওপর আঘাত হেনেছে এবং বিচার বিভাগকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। তাই এ উদ্ভট ব্যবস্থা আমাদের রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের সমস্যার স্থায়ী সমাধান হতে পারে না। তাই আমরা আগামী টার্মের, সর্বোচ্চ আরেক টার্মের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলোপের পক্ষে। কারণ আমাদের আশংকা যে, আমাদের রাজনীতির ক্রমবর্ধমান সংকট অতীতের সমস্যা এড়িয়ে যাবারই ফলাফল।

নির্বাচন কমিশনারদেরকে নিয়ে বিতর্কের মূল কারণ সরকারের একগুয়েমি মনোভাব ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অযোগ্যতা, অদক্ষতা ও পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ। প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে বিচারপতি এম এ আজিজের নিয়োগই ছিল বিতর্কিত। সংবিধানকে উপেক্ষা করে তাকে একইসাথে দু'টি সাংবিধানিক পদে নিয়োগ করা হয়েছে – এ যুক্তিতে হাইকোর্টে একটি মামলাও করা হয়েছে, দুঃখজনক কারণে যার শুনানি করানো সম্ভব হয় নি। এছাড়াও বিচারপতি আজিজ জনস্বার্থের পরিবর্তে কার স্বার্থে কাজ করছেন, তা নিয়েও গুরুতর প্রশ্ন রয়েছে। নির্বাচন কমিশনের সচিব হিসেবে জনাব স ম জাকারিয়ার পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের অনেক অভিযোগ রয়েছে। নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্তির পর ভোটারতালিকা সম্পর্কিত হাইকোর্টের রায় সম্পর্কে বিচারপতি মাহফুজুর রহমানের মন্তব্য তার নিরপেক্ষতাকে দারুণভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করে। নির্বাচন কমিশন নিয়ে গণ-অসন্তোসের মুখে কেন সরকার জনাব মাহমুদ হাসান মনসুরকে চতুর্থ নির্বাচন কমিশনার হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। তাই নৈতিকতার প্রতি কোনরূপ ভ্রূক্ষেপ না করে অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিদেরকে মনোনয়ন দিয়ে ক্ষমতাসীন সরকারই মূলত নির্বাচন কমিশনে জটিলতার সৃষ্টি করেছে। একইসাথে নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে অনেকদিন থেকেই জটিলতা বিরাজ করছে।

আমাদের নৈতিকতা বিবর্জিত এবং ব্যক্তি ও কোটারি স্বার্থে পরিচালিত রাজনীতির কথা ভাবতে গেলে রাজা মাইডাসের কাহিনী মনে পড়ে। ঐশ্বরিক বর পাওয়া রাজা মাইডাস যা'ই ধরতেন তাই সোনা হয়ে যেত। আর আমাদের দেশের রাজনীতির সংস্পর্শে যারাই আসেন, তাদের পক্ষে সততা, ন্যায়নীতি ও নিষ্ঠা বজায় রাখা দুরূহ হয়ে পড়ে। চারদিকে তাকালেই আমরা দেখতে পাই, রাজনীতিতে প্রবেশ করে আমাদের এক সময়ের অতি সৎ ও আদর্শবান ব্যক্তিদের অনেকেই নীতিহীন দস্যুতে পরিণত হয়েছেন। আমাদের কোমলমতি ছেলেমেয়েরা উচ্ছৃঙ্খল ও চাঁদাবাজে পরিণত হয়েছে। তাদের অনেকে দানবের মতো ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছেন এবং আমাদের জাতিকে বিভক্ত করে ফেলছেন। তারা আমাদের সকল গণতান্ত্রিক ও অন্যান্য জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছেন। দেশকে পরিণত করেছেন দুর্নীতিবাজ, কালোটাকার মালিক ও সন্ত্রাসী গডফাদারদের এক অভয়ারণ্যে। তাই নীতিহীন ও দেওলিয়াপনার রাজনীতিই আজ আমাদের জন্য একটি সর্বগ্রাসী সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ এ লঙ্কায় যিনি'ই গিয়েছেন তিনি'ই রাবণে পরিণত হয়েছেন। সুতরাং রাজনীতিকে কলুষমুক্ত করাই সংলাপের প্রধান অগ্রাধিকার হওয়া উচিত।

আমাদের রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়নের অন্যতম কারণ হলো জাতীয় সংসদের অকার্যকারিতা ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দায়বদ্ধতার অনুপস্থিতি। আর নির্বাচন-স্বর্বস্ব, 'একদিনের গণতন্ত্র'ই এর জন্য মূলত দায়ী। একদিনের গণতন্ত্রে নির্বাচনের দিনই গুরুত্বপূর্ণ এবং এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ইজারাতন্ত্র – অর্থাৎ নির্বাচন পরবর্তী পাঁচ বছর দ্বিধাহীনভাবে লুটপাটের অপূর্ব সুযোগ। এ প্রক্রিয়ায় ভোট বহুলাংশে একটি আনুষ্ঠানিকতা মাত্র, যার মাধ্যমে কালোটাকা ও পেশীশক্তির মালিক তথা দুর্বৃত্তরা 'ক্ষমতায়িত' হন। রাজনীতি পরিণত হয় একটি লাভজনক 'ব্যবসায়ে'। আর প্রতিষ্ঠিত হয় নির্বাচিত স্বৈরতন্ত্র ও পরিবারতন্ত্র। এ কারণেই আজ আমাদের দেশে ছলে-বলে-কলে-কৌশলে নির্বাচনে জেতার এক অশুভ প্রতিযোগিতা বিরাজমান। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি আগত নির্বাচনের বহু আগেই সম্ভাব্য প্রার্থীরা অর্থব্যয়ের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছেন।

কিন্তু ভোটই গনতন্ত্র নয়। গণতন্ত্রের জন্য ভোটাধিকার পূর্ভশর্ত হলেও, সত্যিকারের গণপ্রতিনিধিত্বমূলক গনতন্ত্রের জন্য প্রয়োজন: (ক) অবাধ, নিরপেক্ষ ও প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা; (খ) ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তর ও কোনরূপ প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থার অনুপস্থিতি; (গ) নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে সত্যিকারের ক্ষমতা অর্পন, আইন পরিষদের সার্বভৌমত্ব ও কার্যকারিতা এবং ক্ষমতার অন্য কোন কেন্দ্রবিন্দুর অবর্তমানতা; (ঘ) নির্বাচিত প্রতিনিধিদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার কার্যকর বিধান এবং তাদের স্বীয় দায়িত্বে নিবিষ্টতা; (ঙ) সকল নাগরিকের জন্য পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সমসুযোগ ও সমঅধিকারের নিশ্চয়তা; এবং (চ) ক্ষমতার বিভাজন ও চেকস এণ্ড ব্যালেন্সেসের বিধান।

কোন পথে সমাধান?

নব্বইয়ের গণআন্দোলনের পর আমাদের দেশে জনগণের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেও, গনতন্ত্রের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলো বাস্তবায়িত হয়নি। যার ফলে জনগণ ভোট দেয়ার সুযোগ পেলেও সংসদে তাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয় নি এবং গনতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপও নেয় নি। বস্তুত আমাদের গণতন্ত্র এখন চরম হুমকির সম্মুখীন। তাই আজ নির্বাচন, এমনকি সুষ্ঠু নির্বাচনও গণতন্ত্রের জন্য যথেষ্ট নয়।

আর পাঁচজন ব্যক্তিকে বাদ দিলেই নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হবে তার নিশ্চয়তাও দেয়া যায় না। নির্বাচন অনুষ্ঠান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত নয় – এর এখতিয়ার হলো নির্বাচন কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হলেও, এ কাজের জন্য কমিশনের কোন নিজস্ব লোকবল নেই। এ কাজে কমিশনকে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ওপর নির্ভর করতে হয়। জেলা প্রশাসকরাই রিটার্নিং অফিসার এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসাররাই সহকারি রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করেন। নির্বাচন পরিচালনা, প্রিজাইডিং ও পুলিং অফিসারদের নিয়োগ এবং ফলাফল ঘোষণার ব্যাপারে তাদের ক্ষমতা প্রায় নিরঙ্কুশ। তাই প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিরপেক্ষতা সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের অন্যতম পূর্বশর্ত। এছাড়াও সর্বাধিক নিরপেক্ষ এবং সবচেয়ে স্বাধীন ও শক্তিশালী নির্বাচন কমিশনের পক্ষেও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নয়, যদি রাজনৈতিক দল ও তাদের মনোনীত প্রার্থীরা সদাচারণ না করেন। তাই সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়টি বহুলাংশে রাজনীতিবিদদের কোর্টে – তারা অপকর্মে বদ্ধপরিকর হলে কারো পক্ষেই সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভবপর নয়।

আর সুষ্ঠু নির্বাচন হলেই বা লাভ কী? আমাদের বিরাজমান যথেচ্ছাচারের রাজনৈতিক সংস্কারের পরিবর্তন না ঘটলে, সুষ্ঠু নির্বাচন হলেও কালো টাকা ও পেশী শক্তির দৌরাত্মে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত ব্যক্তিরা নির্বাচিত হয়ে আসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। আমাদের আশেপাশে দৃষ্টি দিলেই এ সম্ভাবনা দেখা যাবে। এছাড়াও কিছু ভালো লোক নির্বাচিত হয়ে আসলেও তাদেরকে ক্ষমতার বলয়ের বাইরে রাখা হবে অথবা বিদ্যমান দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতির কবলে পড়ে তারাও দশচক্রে ভগবান ভূতে পরিণত হবেন। তাই সংলাপ ও সংস্কার আলোচনার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত আমাদের দুর্বৃত্তায়িত রাজনৈতিক সংস্কৃতির অবসানের কার্যকর পদক্ষেপ উদ্ভাবন।

সংলাপকে সফল করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলসমূহের কাছে আমাদের কয়েকটি সুস্পষ্ট আবেদন:

- পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানকে নিয়ে অচলাবস্থার অবসান এবং এর নিরপেক্ষতা প্রশ্নাতীতভাবে নিশ্চিত করুন;
- নির্বাচন কমিশনের স্বাধীন সচিবালয় প্রতিষ্ঠা, এর স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ এবং নিরপেক্ষ ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তিদের কমিশনে নিয়োগ প্রদান করুন;
- রাজনৈতিক দলসমূহের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, তাদের আর্থিক স্বচ্ছতা ও মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় দলের প্রাথমিক সদস্যদের পদ্ধতিগত ভূমিকা প্রদানের লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলের বাধ্যতামূলক নিবন্ধনের জন্য একটি আইনি কাঠামো সৃষ্টির সুস্পষ্ট অঙ্গীকার করুন;
- নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের বিস্তারিত সঠিক তথ্য প্রদান এবং 'না-ভোট' ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের 'রিকল' ব্যবস্থা প্রবর্তন করুন;
- কালো টাকার মালিক, পেশী শক্তির অধিকারী, ঋণখেলাপি, বিলখেলাপি, দুর্নীতিবাজ তথা দুর্বৃত্তদের মনোনয়ন না দেয়ার এবং নির্বাচনে প্রার্থীদের আয়-ব্যয়, সম্পদের হিসাব এবং আয়কর রিটার্ন প্রদানের ও প্রকাশের কার্যকর বিধান করুন;
- নির্বাচিত প্রতিনিধিদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, তাদের সুযোগ-সুবিধা হ্রাস এবং তাদের কার্যক্রম সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আইন প্রণয়নের কাজে নিবিষ্ট করার কার্যকর বিধান করুন;
- বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ, ক্ষমতা ও সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ, সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের সংশোধন, নারী সদস্যদের সরাসরি নির্বাচন, জনগনের সত্যিকার ক্ষমতায়ন এবং ক্রমবর্ধমান বৈষম্য ও দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ নির্ণয়ের জন্য 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন এবং কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান করুন; এবং
- পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ও অভিজ্ঞতার আলোকে সংবিধানকে নিরীক্ষার জন্য একটি 'সংবিধান পর্যালোচনা কমিটি' গঠন এবং কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান করুন।

সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের খাতিরে অবশ্যই কিছু ব্যক্তিকে বাদ দেয়ার প্রয়োজন পড়বে। তবে সাংবিধানিক পদ থেকে ব্যক্তিদের বাদ দেয়ার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। কারণ এর কোন শেষ নেই। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগেও একই সমস্যা দেখা দিতে পারে। আমাদের অস্থিতিশীল ও মেনে না নেয়ার রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে তা হওয়াই স্বাভাবিক। এমন পরিস্থিতিতে পুরো বিষয়টিই প্রহসনে পরিণত হবে এবং আমাদের প্রিয় দেশটি শাসনের অযোগ্য হয়ে পড়বে।

পরিশেষে, গণতান্ত্রিক ও ক্লিন বা পরিচ্ছন্ন সরকার ব্যবস্থা প্রত্যেক নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার। কিন্তু আজ আমরা গণতন্ত্র ও যথেচ্ছাচারের মাঝখানে একটি সূক্ষ্মরেখার ওপর দাঁড়িয়ে আছি। আমরা কোন দিকে যাব – প্রগতির দিকে, না অন্ধকারের পথে – তা নির্ভর করবে আমাদের নেতৃবৃন্দের সদিচ্ছা, সাহসিকতা, প্রজ্ঞার ও দূরদৃষ্টির ওপর। আমরা আশা করি, তারা জাতিকে নিরাশ করবেন না। ব্যক্তির পরিবর্তনের সাথে সাথে জনগণ পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানের রূপান্তর এবং বিরাজমান সমস্যার কার্যকর সমাধান চায়।